* সেবা * সংহতি * সমন্বয় * শরণাগতি * শ্রীগুরু-নিতাই রেজি.নং-১১২৭৮৬

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান আশ্রম ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান সেবামণ্ডলের মুখপত্র

উত্তরণ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সূতিকামন্দির

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান।। একচক্রাধাম (গর্ভবাস)।। বীরচন্দ্রপুর।। বীরভূম-৭৩১ ২৪৫।। পশ্চিমবঙ্গ।। ভারতবর্ষ

আষাঢ় সংখ্যা। শ্রীগুরুপূর্ণিমা। ১৪১৮ বঙ্গাব্দ। দশম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা।

পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ (৩৪)

দক্ষিণদেশের বিষ্ণুকাঞ্চী হতে ভারত-পথিক প্রভু নিত্যানন্দের গতি এবার কুরুক্ষেত্রের পথে। সনাতন সংস্কৃতি আর ভাবধারার সাথে একাত্ম হয়ে, কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে আর সকলেরই সমূহ কল্যাণ করতে।

ইতিহাসখ্যাত পাণ্ডব ও কৌরবদের পূর্বপুরুষ, রাজর্ষি ''কুরুর'' নামাঙ্কিত স্থান এই কুরুক্ষেত্র। এ স্থান একদিকে যেমন কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধক্ষেত্র, অপরদিকে তেমনি এক প্রাচীনতম মহাতীর্থপীঠরূপে পরিগণিত। **শ্রীমদ্ ভগবৎগীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির প্রথম পংক্তির প্রথমতম শব্দেই, কুরুক্ষেত্রকে ''ধর্মক্ষেত্র'' আখ্যায় বিশেষিত করা হয়েছে। এ হতেই কুরুক্ষেত্রের পৌরাণিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সহজে অনুমান করা যেতে পারবে।** মহাভারতের শল্যপর্বে (৫৩/২) জানা যায়, নৃপবর কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করেছিলেন বলেই এর নাম কুরুক্ষেত্র। ঋকবেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে, কাত্যায়ণের শ্রৌতসূত্রে, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রমুখ বৈদিক শাস্ত্র-সাহিত্যে উল্লিখিত ''কুরুক্ষেত্র'' নামই প্রমাণ করে এর অনাদিসিদ্ধ মহৎপ্রাচীনত্ব। দৃশদ্বতীর উত্তরে এবং সরস্বতীর দক্ষিণে বিরাজিত এই ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক।

স্মরণাতীত কাল হতে, তীর্থসমূহই ভারতের আত্মিক পরিচিতির ধারক/বাহক। উদারতা আর সমন্বয়বোধে, তীর্থগুলি অভিষিক্ত করছে, সমাগতদের। লোকপাবন প্রভু নিত্যানন্দ, একদা উপস্থিত হয়েছিলেন এই কুরুক্ষেত্রে—এ বিবরণ ''শ্রীচৈতন্যভাগবতে'' (আদি। ৯। ১১৯)। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর, কুরুক্ষেত্রে শুভাগমনের বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি মৌন। ''ভক্তমাল'' গ্রন্থে আছে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও এসেছিলেন কুরুক্ষেত্রে। এ সকল সংবাদ পাওয়া গেল ''গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে''।

জাবাল উপনিষদে এই ভুমি, দেবগণের যজ্ঞস্থান হিসাবে নিরূপিত—তাই মহাতীর্থ। দশ অবতারের একতম শ্রীপরশুরাম, একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূণ্য করবার পর এই কুরুক্ষেত্রেই আপন পিতৃতর্পণ করে শান্ত হয়েছিলেন।

পূর্বে উক্ত মহারাজ কুরু, এই স্থানে হল চালনা করতেন। হল চালনা (কর্ষণ করা) করে তিনি বর পেয়েছিলেন, যে জন এই ক্ষেত্রে তপস্যা করবেন/ যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করবেন, তিনি স্বর্গে যাবেন। মহাভারতে প্রসঙ্গ রয়েছে যে পুরাকালে কোনও এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র, রাজর্ষি কুরুকে এই স্থানে হল চালনা করতে দেখে, এর কারণ তথা স্থানের গুরুত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে কুরু বলেন, এই ক্ষেত্রে যে দেহত্যাগ করবে, সে সকল পাপবিমুক্ত হয়ে স্বর্গে স্থান পাবে। এই সংবাদ জানতে পেরে দেবতাগণ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কারণ—এই স্থানে দেহত্যাগ করে সবাই যদি স্বর্গভোগের অংশীদার হয়ে যান, তবে দেবতাগণ ক্রমে ক্রমে লঘুস্থানীয় হতে পারেন। দেবতারা একদা সমবেত হয়ে ইন্দ্রকে এ বিষয়ে জানালেন। ইন্দ্র যখন বুঝলেন যে মানুষেরা স্বর্গে এসে ভিড় জমালে, দেবতাদের, যজ্ঞভাগলাভে হানি ঘটবে, তখন তিনি রাজর্ষি কুরুর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন যে কুরু যেন বৃথাই বহুশ্রম না করেন, যেহেতু, যিনি উপবাস করে এখানে প্রাণত্যাগ করবেন তিনিই স্বর্গলাভ করতে পারবেন। মহারাজ কুরু তখন ইন্দ্রের কথাতে সম্মত হলেন। কুরু সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে এই ক্ষেত্রেই জীবন অতিবাহিত করেন। অনেকে বলেন, এই কারণেই কুরক্ষেত্রের নাম হয়েছে ধর্মক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রে যার আন্তরিক রতি-মতি, তার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। যে শ্রদ্ধালুজন, কুরুক্ষেত্রের পথে অগ্রসর হন, তাঁর রাজসূয় ও অশ্বমেধ যাগের ফললাভ হয়—শাস্ত্রের অভিমত।

বাস্তববিচারে, কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস হচ্ছে দেবতাত্মা সনাতন ভারতেরই এক স্মরণীয় ইতিহাস। পরমপাবন এই ভূখণ্ডে বিরাজমানা, সরস্বতী নদীর পবিত্র তীরেই প্রথমতম শ্রৌতশাস্ত্রের পঠন-পাঠন হয়েছিল—প্রসিদ্ধি! ব্রহ্মাদি দেবগণ এই পবিত্রস্থানেই যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ এই ক্ষেত্রেই দৈবানুভূতি তথা ঈশ্বরীয় উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, কৌরব এবং পাণ্ডবদের রণাঙ্গনও রচিত হয়েছিল এখানে, উত্তরকালে এক্ষেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃত-উপদেশ শ্রুতি-সার শ্রীমদ্ভগবৎগীতা প্রকাশ পেয়েছেন—যে অমৃত-উপদেশ বুকে ধরে পূর্ণায়ত হয়েছে বেদব্যাসের মহাভারত। এই কুরুক্ষেত্রে অনেক হিন্দু রাজারা হারিয়েছেন তাঁদের রাজ্যলক্ষ্মীকে, মুসলিম বাদশাহগণের সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধি ধূলোয় মিলিয়ে গেছে, মারাঠা শক্তির পতন হয়েছে। প্রতিটি যুগের ইতিহাসে এই কুরুক্ষেত্রকেন্দ্রিক নানা বিবরণ লিখিত হয়েছে জানা-অজানা কত শত মানুষের বুকের রক্ত আর চোখের জলে।

পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ কুরুরাজেরও অনেক আগে, এই স্থান ব্রহ্মার অধ্যুষিত চার বেদীর অন্যতম, ''উত্তরবেদী'' নামে বিখ্যাত ছিল। প্রসিদ্ধ বামনপুরাণের বিবরণে জানা যায়—মহারাজ কুরু এই স্থানে একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সরস্বতীর কিনারে এই পুণ্য ক্ষেত্রে কুরু রাজর্ষি, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও অষ্টাঙ্গ ধর্মের (তপঃ, সত্য, ক্ষমা, দয়া, শৌচ, দান, যোগ ও ব্রহ্মচর্য্য) প্রকাশ-প্রচারের নিমিত্ত একটি পীঠ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে সুবর্ণ রথে আরোহন করে এসেছিলেন এই স্থানে, পরে সেই সোনা দিয়েই তৈরি হয়েছিল ক্ষেত্রকর্ষণের হল (লাঙ্গল)। কুরু, মহাদেবের নিকট হতে ষাঁড় আর যমরাজের কাছ থেকে মহিষ নিয়ে প্রথমতম জমির চাষের কাজ আরম্ভ করেন। কুরু যখন কর্ষণরত সেই সময়ে একদা উপস্থিত হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই কৃষিকাজের কারণ/প্রয়োজন। রাজার উত্তর—অষ্টাঙ্গ ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জমি তৈরি করছেন। আবার জিজ্ঞাসা ইন্দ্রের—কৃষিকাজ তো হল। কর্ষণের পর তো বীজবপন। বীজ কোথায়? উত্তর —''বীজ কাছেই রয়েছে।'' ইন্দ্র চলে গেলেন।

এদিকে রাজা প্রত্যহ সাতক্রোশ করে জমি চষতে লাগলেন ও এইভাবে, আটচল্লিশ ক্রোশ জমির কর্ষণ শেষ করলেন। একদা এলেন স্বয়ং বিষ্ণুভগবান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ---''রাজন্! কি করছেন?'' রাজা উত্তরে সেই পূর্বের কথাই বললেন। বিষ্ণু বললেন—''রাজা! আপনি আমায় বীজ দিয়ে দিন। আমি বপনের দায়িত্ব নিচ্ছি।'' রাজা এবার ডান হাতটি প্রসারিত করলেন বিষ্ণুর সামনে। বিষ্ণুভগবান আপন সুদর্শনচক্রে, ডান হাতটিকে সহস্রখণ্ডে ভাগ করলেন ও সেই খণ্ডগুলিকে ছড়িয়ে দিলেন রাজার চষে দেওয়া জমিতে। এইভাবেই মহামতি রাজর্ষি কুরু, দান করলেন তাঁর বাম হাত এবং পা দুখানি। শেষে নিজের মস্তকদেশও সমর্পণ করলেন বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে। বিষ্ণুভগবান এবার বললেন কুরুরাজকে—অভিলষিত বর গ্রহণ করতে। মহামতি কুরু বললেন—আমার কর্ষিত যাবতীয় ভূখণ্ডই পুণ্যপীঠ তথা ধর্মক্ষেত্র বলে খ্যাত হোক। আমার নামানুসারে এ ভূখণ্ড সুচিহ্নিত হোক। ভগবান শিব, সকল দেবগণের সাথে, এখানে বাস করুন। এখানে স্নান, তপস্যা, যজ্ঞ, উপবাস প্রমুখ সৎ অনুষ্ঠান তো বটেই, যাবতীয় কর্মাদি শুভদ হোক। যাঁরা এখানে দেহত্যাগ করবেন, সকলেই যেন স্বর্গে ঠাঁই পান। সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু বললেন—''তাই হবে।'' মহাভারতে দেখা যায়—ঋষিগণ, সহস্র সহস্র শিক্ষার্থীসহ কুরুক্ষেত্রের সরস্বতীতটে বাস করতেন, নিজ নিজ আশ্রমে। তাই কুরুক্ষেত্র ছিল তখন সর্বোত্তম ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। পরবর্তীকালে এখানেই আঠারো দিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের পরস্পরের মধ্যে। এই অঙ্গনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে ''গীতা'' প্রকাশিত হয়ে অনন্ত জগতের অবাধ মঙ্গলের সিংহদ্বারকে প্রকাশ করেছে। গীতা-প্রশস্তি—''সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থ বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।'' **ভগবান কৃষ্ণের মুখারবিন্দ হতে নির্গলিত, পবিত্র প্রসাদ গীতামৃতেরই পুণ্য প্রকাশপীঠ এইকুরুক্ষেত্র।যে অমৃতের সন্ধানে এখানে এসেছেন প্রভু নিত্যানন্দ।** যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে উপলক্ষ করে, সারা জগতের প্রতিটি মানুষকেই সচেতন করতে চেয়েছেন গীতার মহতী বাণী শুনিয়ে, সেই স্থানটি কুরুক্ষেত্র এলাকায়, বিরাজিত। সে স্থানে রয়েছে জ্যোতিঃসর নামে এক সুবিশাল জলাশয়। জ্যোতিঃসর শব্দের অর্থ,আলোর অর্থাৎ জ্ঞানের সর/সরোবর। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে এ স্থানটি তাঁর রাজধানীর সামিলই ছিল। বর্ত্তমান থানেশ্বরের তিন মাইল পশ্চিমে এবং কুরুক্ষেত্র হতে পৃথূদক(পেহবা) যেতে, এই স্থান। এ স্থানে রয়েছে, পুরাকালীন কয়েকটি বটগাছ, তার মাঝে প্রবীণতম অক্ষয়বটই মাত্র গীতার আবির্ভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। এটি তৎকালীন মহীরুহ—এমতি প্রসিদ্ধি।

ইতিহাস আলোচনায় জানা গেছে মহাভারতের সময় হতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের আমল অবধি এই ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক উন্নতি বিরাজমান ছিল। তিনশত খৃষ্টপূর্বাব্দে এদেশে এসেছিলেন গ্রীক দুত মেগাস্থিনিস। তাঁর ভ্রমণের বিবরণে আছে— রাতে সবাই দরজা খুলেই শোয়। আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত। স্ত্রীলোকেরা শুচিস্বভাব। দেশে চুরি/অত্যাচার নাই। সর্বত্র শান্তি। হিন্দু ও বৌদ্ধ— সকলেই মিলে মিশে আছে। হর্ষের কালে আগত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-ও একথাই বলেন।

বহুতর তীর্থের মহামিলন-পীঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন সমন্বয়মূর্ত্তি প্রভু নিত্যানন্দ। তীর্থ ভ্রমণ কেবলই পুণ্য সঞ্চয় নয়, তীর্থভ্রমণ মানুষকে করে উদার,ত্যাগব্রতী আর সহনশীল। আমি আর আমার ভুলিয়ে, সকলকে ভালোবাসতে শেখায়। অভিষিক্ত করে সার্থক মনুষ্যত্বের দিব্য আসনে। উদারচরিত হয় মানুষ। অনুভব করে ''বসুধৈব কুটুম্ব কম্।''

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থানে দশ বছর ধরে নতুন মন্দিরের কাজ চলছে। সবার সহযোগ/দান সাদরে গৃহীত হবে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান। নিতাইবাড়ি। একচক্রাধাম। গর্ভবাস। বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম-৭৩১ ২৪৫। পশ্চিমবঙ্গ হতে শ্রীজীবশরণ দাস দ্বারা প্রকাশিত। গ্রাহক মূল্য-তিন টাকা।

প্রসঙ্গ প্রসাদ ....“✷✷✷✷ আর একটু এগিয়ে যাও না—”

লোকপাবন শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের করুণাধন্য শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ কবিরাজ, স্বরচিত **“শ্রীরাধারমণ-আম্নায়মালিকা”** গ্রন্থে প্রেমভরে কীর্ত্তন করেছেন—“ শ্রীল রামদাস নামে মূর্ত্ত যিঁহ ধরাধামে সংকীর্ত্তনানন্দ-অবতার। অকিঞ্চন-সমাশ্রয় নিখিল মঙ্গলালয় কিবা সাধ্য তাঁরে বর্ণিবার!! রাজা মহারাজা হতে ভিখারী যে রহে পথে কৃপাধন্য হয় তাঁর অযুত জন। সবারে করুণা করি বিলাইলা আগুসরি নিতাই-গৌরাঙ্গ-নাম ধন।। কেহ বৈসে মথুরাতে কেহ গয়া প্রয়াগেতে বারাণসী বৃন্দাবনধামে। দাক্ষিণাত্যে অংশে অংশে গুজরাটে মদ্রদেশে বঙ্গভূমে চট্টলে আসামে।। নবদ্বীপে শ্রীউৎকলে বৈসে কেহ বিন্ধ্যাচলে কেহ নিত্যধাম-অধিবাসী। নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী কেহ তূর্য্যাশ্রমধারী কেহ গৃহী কেহ বা উদাসী।। সবাই বিশুদ্ধসত্ত্ব গৌরপ্রেমে মহামত্ত লীলাছলে এথা পরকাশ। **তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একান্ত শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ দাস।।**” সেই সুচিহ্নিত গৌরাঙ্গ দাস!! (পূর্বাশ্রমে যাঁর নাম ছিল ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)। এ হেন গুণবন্ত হয়েও যিনি দৈন্য-বিনয়ের খনি! নিষ্ঠা-বৈরাগ্যের মূর্তি! ব্যবহারিক দেহানুসন্ধান ছিল না যাঁর!“দেহস্মৃতি নাহি যাঁর সংসার কূপ কাঁহা তার”—এ নয়নে এ রাজ্যে তাঁকে দেখা যেত বটে, কিন্তু তাঁর ভাবস্ফূর্ত্তি, তাঁর রসোদ্গার,তাঁর প্রণয়বিহ্বলতা আর সর্বোপরি শ্রীগুরুচরণে অনন্যমমতায় অনুভূত হত এ রাজ্যে বিরাজমান আছে মাত্র তাঁর দেহটিই, তাঁর ডগমগ হৃদয়টি কিন্তু রয়েছে অথৈ অনুভবের রসে-গড়া ভাবে-ভরা সেই তন্ময় রাজ্যের মণিকোঠায়!

ভাগবতী কথায় আছে “....তত্র লৌল্যমেব মূল্যমেকলং....” নইলে কোটি জন্মের সুকৃতিতেও বোধ করি লাভ হয় না বহুবাঞ্ছিত সেই অক্ষয় বৈভব—প্রেমধন। সেই লৌল্য/ লালসা/উৎকণ্ঠা/করুণালাভের জন্য অবাধ ব্যাকুলতাই, মনোমত আধার পেয়ে নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরেছিল ধীরেন্দ্রনাথের অতিমর্ত্য মানস-মহলে। কৈশোরেই বাড়ির কাছের এক মাতৃমন্দিরে গিয়ে পথহারা অবুঝের মত অঝোরে কাঁদতেন তিনি। সাঁঝের আঁধারে তাঁর সেই বাঁধভাঙা চোখের জল সবার অলক্ষ্যে এগিয়ে যেত মোহনার পথে, মিলতো প্রার্থিতের সঙ্গমে। ঐ বয়সের ছেলেরা হেসে-খেলে কূল পায় না, আর ইনি কাঁদেন কেন? মাতৃসমীপে ইনি প্রার্থনা করেন আশ্রয়লাভের লক্ষ্যে উপনয়নের নির্দেশ পেতে—তাই।

এর মাঝে দেখা হয়েছে মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সাথে। তিনি ভরসা দিলেন—“উদ্বেল হোয়ো না। আমি তোমার গুরু নই, তোমার গুরু জনৈক সিদ্ধ বৈষ্ণব। অবশ্যই তাঁর কৃপা হবে। অপেক্ষা কর।”

আলস্য নয়, আন্তরিক অপেক্ষাই প্রাপ্তির প্রসূতি। সেই অকপট অপেক্ষাই নিয়ে এল বাঞ্ছিত লগ্ন! কলকাতার কলুটোলায় শীলবাড়িতে, শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে কৃতার্থ হলেন ধীরেন্দ্রনাথ। শ্রীগুরু-কৃপায় উত্তরিত হলেন আনুগত্যের রাজ্যে। রথযাত্রায় পুরী গিয়ে শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ-প্রসঙ্গে শ্রীমন মহাপ্রভুর আচরিত সেই পুরাতনী লীলা আস্বাদনের নবীয়সী স্ফূর্ত্তিতে ভরপুর হয়ে, ব্রজে যাবার ইচ্ছা অন্তরে বলবতী হলেও, তাঁকে আসতে হল কলকাতা হয়ে নবদ্বীপে। অমোঘ কালের টানে।

এর পরপরই তিনি, শ্রীগুরুদেবের আদেশ পেলেন, ব্রজে যাবার। সে আদেশ মাথায় নিয়ে, বৃন্দাবনে আসেন ধীরেন্দ্রনাথ। ভজনভূমি ব্রজমণ্ডলের ক্ষীরখণ্ডসদৃশ সন্তজনেরা স্বল্প দিনেই আপন করে নিলেন ধীরেন্দ্রনাথকে। শাহজীর দেবালয়/শৃঙ্গারবট/ পরে পুরাতন কালিদহে সিদ্ধ জগদীশদাস বাবার কাছে সাময়িক থাকলেন ধীরেন্দ্রনাথ। স্নেহভরে জগদীশবাবা, “গোপাল” বলে ডাকতেন ধীরেন্দ্রনাথকে। বহু বিষম পরীক্ষাও করেছেন। অন্তর্দর্শী জগদীশবাবা বুঝতে পারলেন—অবাধ অনুরাগ, অপার ধীশক্তি আর অগাধ নিষ্ঠাগুণে এ ছেলেটি অসমান্তরাল। তিনি গোপালকে, অনুশীলনের একান্ত আধার জেনে আদেশ করলেন সিদ্ধ রামকৃষ্ণ দাস পণ্ডিত বাবার কাছে গিয়ে তাঁর আদেশানুমতে, ভক্তিশাস্ত্রপাঠে মন দিতে। তাই হ'ল। অনুগত তথা মনোমত পরমার্থী পেয়ে পণ্ডিতবাবা, নিজেকে উজাড় করে দিলেন গোপালের কাছে। সুস্থ ব্যবহার আর শুদ্ধ পরমার্থে অগ্রবর্তী গোপাল ক্রমে ব্রজ-চৌরাশিক্রোশের মাঝে সন্তসমাজে একটি সুচিহ্নিত আসনের অধিকারী হয়ে উঠছেন দেখে পুলকিত পণ্ডিতবাবা তাঁকে এক দিন স্নেহভরে বললেন—“সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যম্ এবাভয়ম্”—আপন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সমীপে গিয়ে বৈরাগ্য-বেশাশ্রয় গ্রহণ করে, পুনঃ ব্রজে আসতে। আদেশ মাথায় নিয়ে ধীরেন্দ্রনাথ এলেন পুরীতে, যেহেতু শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় এ সময়ে পুরীতেই ছিলেন। যথাসময়ে শ্রীহরিদাস সমাধি মঠে, ধীরেন্দ্রনাথ, বৈরাগ্য-বেশ তথা ভাগবত পারমহংস্য সন্ন্যাসমন্ত্র লাভ করলেন, শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের কাছ হতে, প্রভু নিত্যানন্দেরই দুয়ারে। বেশাশ্রয় তো গোপীভাবাশ্রয়। মনে এল, শ্রীচৈতন্যভাগবতের অমৃত-অনুভব “গোপীগণের যেই প্রেমা কহে ভাগবতে। একা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে।। ” ধীরেন্দ্রনাথ পেলেন নতুন সাধন-জীবন। অবিরোধে এগিয়ে যাবার নিরপেক্ষ পথ। লক্ষ্যের নিশানা। সার্থক নাম পেলেন গৌরাঙ্গদাস।

বেশাশ্রয় লাভ ক'রে, শ্রীগুরুকৃপাধারে পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে গৌরাঙ্গদাস এলেন বৃন্দাবনে। সিদ্ধ রামহরিদাস বাবা, মাধবদাস বাবা, হরিচরণদাস বাবা, সিদ্ধ রামকৃষ্ণদাস পণ্ডিত বাবা আর সিদ্ধ জগদীশদাস বাবা প্রমুখের সৎপ্রসঙ্গে, চাঁদিমার টানে উছলিত সাগরের মতই বিহুল তাঁর অন্তর! প্রবলতর তরঙ্গায়িত এখন গৌরাঙ্গদাসের ভাবসিন্ধু! **শ্রীগুরুচরণ বুকে ধরে তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন—“গৌরপ্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যে বা ডোবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।”**

উত্তরকালে। পণ্ডিতবাবা বাস করছেন বৃন্দাবনে— দাউজীর বাগিচাতে। বাবার আদেশেই তাঁর আদরের নিধি গৌরাঙ্গদাস এই কালে “শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত” পাঠ করছেন। দিনে, পণ্ডিত বাবার কাছে গ্রন্থ দেখেন। রাতে পাঠ করেন। স্মরণীয় ঘটনা,স্বয়ং গৌরাঙ্গদাসজীর শ্রীমুখে— “তখন শ্রীরামকৃষ্ণদাস পণ্ডিত বাবার কাছে গ্রন্থ দেখি। তাঁর আদেশে মাধুকরী পেয়ে, রাত নয়টা হতে এগারোটা অবধি পাঠ করি। একদিন বিকালে গ্রন্থ দেখছি। এক জায়গায় না বুঝতে পেরে, জানতে গিয়ে দেখি যে, পণ্ডিত বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। মনে করলাম ভজন করছেন। বল্লাম—বাবা! উত্তর এলো ঘরের ভিতর হতে—কে? আমি সাড়া দিলাম—গৌরাঙ্গদাস। বাবা বললেন—কি খবর? আমি বাহির হতেই বললাম—পাঠ লাগাতে পারছি না। বাবা বললেন—স্থানটি পড়। তখন আমি যে জায়গাটি বুঝতে পারছি না, সে স্থানটি পড়লাম। তিনি ঘরের ভিতর হতেই বুঝাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বলছেন—বুঝতে পারছ ? আমি বলছি—হাঁ। বাবা বললেন—তুমি সুবোধ, তুমিতো বুঝবেই। যখন সব বোঝা হয়ে গেল, তখন বল্লাম—যাই? বাবা বললেন—যাও। বেরিয়ে আসছি, দেখছি পণ্ডিত বাবা, বেশ খানিকটা দূরে, কৃপাসিন্ধুকে নিয়ে কোথা হতে আসছেন! আমি তো অবাক্। মনে করলাম, এ কোনো সিদ্ধাই হবে। রাত্রে মাধুকরী পাবার সময় বৈকালের কথাই মনে জাগছে। খেতে পারছি না। বাবাও পাশেই। বলছেন—শরীর অসুস্থ? তবে আজ পাঠ করে কাজ নাই। আমি তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন—আমি এ ব্যাপারে মোটেই জানি না। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত কি জান? অনেক সাধু-মহাত্মা এই স্থানে ভজন করেছেন, শরীর ত্যাগ করেছেন। তাঁরা সূক্ষ্ম দেহে এখানেই আছেন। উন্মুখী জীবকে সহায়তা করতে, তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁদের মধ্যে কেউ আমার কণ্ঠস্বর ও স্বরূপ নিয়ে, তোমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তখন বুঝলাম যে তাঁরা এক স্বরূপে নিত্যলীলায় সেবা করছেন, আর এক স্বরূপে সাধকভাবে আছেন। অন্ততঃ যাঁরা, জীবকে উন্মুখী করবেন—এই **MISSION** নিয়ে আসেন, তাঁদের সম্বন্ধে একথা ধ্রুব সত্য! বড়বাবা আছেন, এ এত ধ্রুব সত্য যে, চন্দ্র-সূর্য্য আছে এও মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু বড়বাবা আছেন, এ নিঃসন্দেহ।”

গৌরাঙ্গ দাদা সময় সময় ব্রজে পর্যটন কালে যত্র তত্র রাত্রিবাস করতেন। এক কৃষ্ণপক্ষের রাতে পথশ্রান্ত গৌরাঙ্গ দাদা মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য,আশ্রয় নিয়েছেন এক ব্রজবাসীর বাহিরের ঘরে। মাঝ রাত্রে সে বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। সম্মিলিত পরিশ্রমে মোটা গাছের গুঁড়ির ধাক্কায় দরজা ভেঙ্গে হুড়মুড় করে নিশাচর দস্যুদল ঢুকে পড়েছে সেই ঘরে! একটি নিষ্প্রভ কেরাসিন তেলের আলো জ্বলছিল। গৌরাঙ্গদাদা স্মরণে রত। স্বল্প আলোয় চিক্ চিক্ করছে গণ্ডদেশের অশ্রুজলধারা। ডাকাতরা ঘরে ঢুকেই তুরন্ত চলে এসেছে তাঁর কাছে। কি বিধির নির্বন্ধ! দস্যুদলপতি হঠাৎ এসে লুটিয়ে পড়লো সামনে। গৌরাঙ্গদাদা ধীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—“রাধে”। দলপতি বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো— “আরে গৌরাঙ্গবাবা! আরে বাবা! তু হিঁয়া কেঁও আয়ো?” দস্যুরা পালিয়ে গেল। এমনই ছিল তাঁর সর্বাতিশায়ী প্রভাব! যেমন সুজনের অন্তরে, তেমনই দুর্জনের মনে। **স্মরণ হয়, মহাজনী অনুভব—“গৌর প্রেমে হয়ে বিভোর। জানে না নিতাই, কে আপন কে পর!!”** সবার অন্তরে যে নিত্যানন্দের নিবাস, তাঁর সাথেই গৌরাঙ্গদাদার মিতালি!

শিমুরালি মঠের শ্রীরাধারমণ দাদার কাছে শোনা প্রসঙ্গ। বৃন্দাবন-রমণরেতির শ্রীরাধারমণ নিবাস। পূর্বাহ্নকাল উত্তরিত। স্মরণ-বন্দন অন্তে এইমাত্র একটু টান হয়েছেন গৌরাঙ্গদাদা, মৃদুস্বরে কোনও গূঢ় প্রসঙ্গ করছেন নিম্বার্কপন্থী সুরেশ্বরদাসজীর সাথে, শুয়ে শুয়েই। হঠাৎ মনোহরদাসজী এসে হাজির, ত্বরিতে। বলছেন—“একজন সাধু এসেছেন গুজরাট হতে বৃন্দাবনে। আপনাকে দর্শন করতে আসছেন।” শীঘ্র উঠে, সেবককে গৌরাঙ্গদাদা বললেন, শ্রীনামমালা দিতে। সমাগত হলেন সেই আগন্তুক সাধুজী। সাক্ষাৎ-সদালাপ অন্তে সাধুজন বিদায় নেবার পরে সেবক বললেন—“বাবা! মহাত্মাজী আসছেন শুনে হাতে জপের মালা নিলেন কেন?” মিতভাষে বললেন গৌরাঙ্গদাদা— “আমাকে মহাত্মা বোধে দর্শন করতে এসেছেন ইনি। যদি দেখেন, এত বেলায় আমি আরাম করছি, তাহলে ওনার মনে বিক্রিয়া আসতে পারে—হায় হায় এই মহাত্মা! নেহাৎ ভোগীর মত এত বেলাতেও শুয়ে!! কি সাধুই দেখতে এলাম!!! আমার অন্তরের খবর তো উনি জানেন না। তাই যাতে বিরূপ সমালোচনা উনি না করেন, উঠে বসে মালা হাতে করলাম ।” এ প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের কওয়া কথা মনে এল—“যেভাবে চললে, অপরে সমালোচনা করে অপরাধী হয় না, তাই সদাচার।” **দেখা গেল—গৌরাঙ্গদাদার আচরণে বাবাজী মহাশয়ের অনুভব, ষোল আনাই মূর্ত্ত !**

একবার গৌরাঙ্গদাদা এসেছেন জয়নগর-মজিলপুরে। বিকালে শ্রীগুরুভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে বলেন—“শুনেছি রজনী, জয়নগরের মিছরি (মিশ্র-উপাধিক বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার) দের বাড়িতে কিছুকাল ভজন করেছিল, তা—সে স্থানটি কোথায়? আমায় দেখাতে পারিস্?” বিজয়দাদা বললেন—“আসুন”। তারপর তাঁকে নিয়ে এলেন জনবিরল ঐ বাড়িতে। একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের বদ্ধ দরজার সামনে এসে বিজয়দাদা বললেন—“রজনীদাদা এই ঘরেই ভজন করতেন।” হঠাৎ গৌরাঙ্গদাদা—“দেখিতো রজনী কি করছে” বলে, দরজায় ধাক্কা দিয়ে দরজাটি খুলে ফেলতে একটা শব্দ হোল। ভিতরে ঢুকেই, গৌরাঙ্গদাদা বেরিয়ে এলেন বাহিরে। দরজা বন্ধ করলেন। আবার একটা শব্দ! গৌরাঙ্গদাদা বললেন—“রজনী, জলশৌচ ও হাতমাটি করে এখন ঘটি মাজছে, কুসুমসরোবরের পাড়ে বসে।” বিস্মিত বিজয়দাদা, কৌতূহলবশে, ঐ সময়ের যাবতীয় বিবরণ, পত্রে জানতে চাইলেন রজনীদাদার কাছে। রজনীদাদার উত্তর এল—“ঘটাং শব্দ শুনে পিছনে চেয়ে দেখি গৌরাঙ্গদাদা দাঁড়িয়ে। আবার একটি শব্দ হবার সাথে সাথেই দেখছি গৌরাঙ্গদাদা অন্তর্হিত!” (১৩৮৮ বঙ্গাব্দের রথযাত্রার দিনে শ্রীবিজয়দাদা, এ প্রসঙ্গটি বলেছেন)।

গৌরাঙ্গ দাদার সতত, “জগৎ ভরি নিতাই খেলে”—এই অনুভব। পরিক্রমার পথে একদিন আসছেন গৌরাঙ্গদাদা। পথে, গৃহস্থ বাড়ির গায়ে ভীড়। গৌরাঙ্গদাদা আবেশভরে পথ চলছিলেন। সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন “কা হুয়া?” উত্তর—“বাচ্ছা হুয়া।” দাদা স্মিত হেসে বলেন “আচ্ছা হুয়া। আচ্ছা হুয়া। আচ্ছা হুয়া।”—এ প্রসঙ্গ দিল্লীর সুশীলজীর।

নিত্যানন্দ জন্মস্থানে বাবাজী মহাশয় এসেছিলেন ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। ছিলেন—২৫ ও ২৬ মাঘ। শনি ও রবিবার। বিদায় নিলেন ২৭ মাঘ, সোমবার। দুপুরের পরে। সাথে ছিলেন গৌরাঙ্গদাদা প্রমুখ অনেকে। দুই দিনই গৌরাঙ্গদাদার নিয়ামকত্বে প্রভাতীপথ-পরিক্রমায়, নামানন্দে উছলিত হয়েছিল এ অঞ্চল। পরিক্রমা অন্তে গৌরাঙ্গদাদা যখন প্রণাম করতে লুটিয়ে পড়লেন বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে, তখন বাবাজী মহাশয়ের মুখে ফুটে উঠেছিল সমকালীন আনন্দ ও গৌরবে মাখামাখি এক উজ্জ্বল হাসি। যে হাসিতে প্রকাশ পেয়েছিল, একান্ত সমপ্রাণ অন্তরঙ্গ যোগ্য সন্তানের অলোকগৌরবে উছলিত পিতৃ-হৃদয়ের অনন্য ভাবোল্লাস!

বাবাজী মহাশয় ব্রজধাম হতে আসছেন কলকাতায়। রেলগাড়ির নির্দিষ্ট বগিতে উঠে বসেছেন একক আসনে, জানালার ধারে। গৌরাঙ্গদাদা সামনে দাঁড়িয়ে, প্লাটফর্মে। বাবাজী মহাশয় ইঙ্গিতে গৌরাঙ্গদাদাকে বললেন—“ওঁরা (ঘরের সবাই) বলছিলেন .... পাঠ খুবই হার্দ ..... তবে উনি প্রায়শঃ ব্রজযুগলকে পৃথক রাখতে পারছেন না। স্রোতবৎ লীলা বজায় থাকছে না! ঘরের হিসাব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।” গাড়ি তখন গা-নাড়া দিয়েছে। গৌরাঙ্গদাদা অঝোরে কাঁদছেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। বাবাজী মহাশয় বললেন—**“গৌরাঙ্গদাস! আর একটু এগিয়ে যাও না।” অর্থাৎ কিশোরী-কিশোরকে মিলিয়ে গৌর করে দাও না!**

গৌরাঙ্গদাদা যে শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের কতদূর অন্তরঙ্গ ছিলেন, তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়, তাঁর সঙ্গোপন-রহস্যে। সন ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ১৮ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর । ১৯৫৩) শুক্রবারে রাত দু'টোর পরে, শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের অদর্শন! গৌরাঙ্গদাদার আশ্রমে, সংবাদ গেল। সেবক অবধূতবাবা তারবার্ত্তা পেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন। শোকাচ্ছন্ন অবধূতবাবাকে দেখেই গৌরাঙ্গদাদা বোধকরি অনুমান করেছিলেন বিষয়টি। সোচ্চার হয়ে ওঠেন তিনি—“কা অবধূত! বাবা চলা গয়া?” বলেন—**“বিদ্যা, বুদ্ধি , বল—সকলি চলে গেল। আর কি নিয়ে থাকবো। যাওয়াই ভাল!”** এরপর অন্তর্মনা দশায় অতিবাহিত হয় ত্রয়োদশ দিন! সন ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর। ১৯৫৩) বুধবার (বেলা ২-৪০), গৌরাঙ্গদাদার সঙ্গোপন! গাঢ় আঁধার নেমে এল!—পূর্ব ও উত্তর দু দিকেই!!

এ প্রবন্ধের এখনও বাকি! আগামী ‘ধীমহি-১৪১৮’-তে সাধ্যমত পূরণের আশা!

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা-শ্রীপাট✷✷✷✷ কীর্ত্তনতীর্থ ময়নাডাল।

বর্দ্ধমান জেলার রাজুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন কালিচরণ মিত্র। তিনি মুর্শিদাবাদ-নবাব-সরকারের দেওয়ান-পদে নিযুক্ত ছিলেন। শক্তিমন্ত্রের উপাসক দেওয়ান কালিচরণের আর্থিক সংগতি ও সামাজিক সম্মান যথেষ্ট থাকলেও তিনি নিঃসন্তান-বিধায় অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটাতেন। একরাত্রে তাঁর স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন ঠাকুর বলছেন—মা! শীঘ্রই তোমার দুঃখ দূর হবে। তুমি কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করো। সন্তানের নাম রেখো নৃসিংহবল্লভ। এরপরই যথাসময়ে শুভ লগ্নে মিত্র-জায়া এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। জাতকের নাম রাখা হ'ল নৃসিংহবল্লভ। জাতক, যৌবনে পদার্পণ করলে শ্রীযুক্ত কালিচরণ মিত্র মহাশয়, কুলগুরুর নিকটে নৃসিংহবল্লভকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মিত্র-জায়া স্বামীর এই উদ্দেশ্য অনুভব করে, তাঁকে পূর্বের স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালেন। সকলি অনুভব করে, কালিচরণ, কুলগুরুর নিকট নৃসিংহবল্লভের দীক্ষাকার্য্য স্থগিত রাখলেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় অল্পকালের মধ্যেই শ্রীপাদ মঙ্গল ঠাকুর রাজুরগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। এ সংবাদ কানে আসা মাত্রই নৃসিংহবল্লভ, শীঘ্রগতি মঙ্গল ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হয়ে বহুতর অনুনয় করে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। অচিরে শ্রীপাদ মঙ্গল ঠাকুরের নিকট, নৃসিংহবল্লভের দীক্ষা হয়ে গেল। দীক্ষার পর হতেই তাঁর অস্থির মতি একান্তভাবে পরিবর্তিত হ'ল এবং সংসার, পিতামাতা তথা বিষয়-সম্পদের প্রতি ঔদাসিন্য দেখা গেল। বাবা-মা, নৃসিংহবল্লভের এই প্রকার মানসিকতায় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন এবং তার মতি পরিবর্তনের জন্য নানা প্রকারে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু নৃসিংহবল্লভের কোনও বিষয়াবেশ দেখা গেল না। বাবা-মায়ের দেহান্তের পর নৃসিংহবল্লভ তাঁর পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি অবহেলে পরিত্যাগ করে পিতৃভূমি ত্যাগ করলেন।

পথে পথে একসময়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন বীরভূম জেলার অন্তর্গত ময়নাবন নামে একস্থানে। ময়নাকাঁটার বন ছিল এ গ্রামে, তাই এ নাম। ক্লান্ত নৃসিংহবল্লভ বিশ্রামের জন্য এক বৃক্ষমূলে বসতে, তাঁর ঘুম পেল। স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদেশ করছেন—তাঁর বিগ্রহ নির্মাণ ক'রে সেবার নিমিত্ত। নৃসিংহবল্লভ বললেন—আমার কপর্দকও নাই। এমতাবস্থায় সেবার ব্যয় নির্বাহ হবে কি ভাবে? শ্রীমন্ মহাপ্রভু করুণাপরবশ হয়ে বললেন, ভিক্ষা করে তুমি যা দেবে, আমি তাতেই পরিতৃপ্ত হব। একথা শুনে নৃসিংহবল্লভের অপার আনন্দ! তাঁর অন্তরে আর কোনও অস্বস্তি রইলো না।

ময়নাবনের সামিলই ময়নাডাল গ্রাম। পরদিন নৃসিংহবল্লভ সেখানে উপস্থিত হলে অনেকেই, কিহেতু তিনি এখানে এসেছেন—প্রশ্ন করতে লাগলেন। নৃসিংহবল্লভ তাঁদের, মহাপ্রভু-দত্ত স্বপ্নের বিষয় নিবেদন করলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের লোকদের সহায়তায়, নৃসিংহবল্লভের জন্য একটি খড়ের ঘর নির্মিত হলো।

এখন নৃসিংহবল্লভের একান্ত প্রচেষ্টা শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশের। ঠাকুর বললেন, দেখা দিয়ে—এই বনাঞ্চলেই একটি সারবান প্রাচীন নিমগাছ রয়েছে। সেই দারু সংগ্রহ করে, নিকটবর্তী সুগড় গ্রামবাসী বৃদ্ধ স্বরূপ সূত্রধর নামক ভাস্করের দ্বারাই বিগ্রহ নির্মাণ করো। নৃসিংহবল্লভ স্বয়ং সুগড়ে গিয়ে সংবাদ নিয়ে জানলেন—ভাস্কর বর্তমানে অন্ধ! নৃসিংহবল্লভ ফিরে এলেন। সকলই জানালেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভয়চরণে। মহাপ্রভু বললেন—"এখন তুমি ভাস্করের কাছে আবার একবার যাও। সে তার দুই চোখেরই দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে।"

পরদিনই নৃসিংহবল্লভ পুনরায় রওনা হলেন সুগড়ের পথে—ভাস্করের সাথে দেখা করবার জন্য। রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল। প্রবীণ ভাস্কর ময়নাডালের দিকেই আসছেন। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অচিন্ত্য অনুগ্রহে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন। বিগ্রহের দারু সংগৃহীত হতে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নটনপর বিগ্রহ নির্মিত হয়ে, সেবায় বসলেন। ইদানীং প্রভুর আদেশে নৃসিংহবল্লভকে গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। কালে একটি পুত্র সন্তান হলে নৃসিংহবল্লভ তার নাম রাখেন হরেকৃষ্ণবল্লভ। ছেলেকে শৈশব হতেই বাতুলপ্রায় দেখে বড় হতাশ হয়ে পড়লেন নৃসিংহবল্লভ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। তিনি ঠিক করলেন গ্রামস্থ ভক্ত-সজ্জনদের হাতে মহাপ্রভুর সেবা সমর্পণ করে দেবেন। এই মর্মে সকলকে ডেকে পাঠিয়ে, যখন তিনি সেবা হস্তান্তরের বিষয়ে কথা বলছেন তখন হরেকৃষ্ণবল্লভ উপস্থিত হয়ে, পিতাকে নিশ্চিন্ত করলেন—মহাপ্রভুর সেবা তিনিই সুস্থভাবে সমাধান করবেন। আশ্বস্ত নৃসিংহবল্লভ নির্দিষ্টকালে নিম্নলিখিত পদকীর্ত্তন করতে করতে দেহত্যাগ করলেন—যে পদ আজও তাঁর উত্তরপুরুষেরা নন্দোৎসবের দিন মহাপ্রভুর অঙ্গনে কীর্ত্তন করে থাকেন—"শচীর নন্দন! নাথ! দয়া করো মোরে। কুক্কুর করিয়া রাখ নিজভক্ত-ঘরে।। যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই। ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই।। যেখানে সেখানে যেন জন্মিয়া না মরি। এই কৃপা করো প্রভু তোমায় না পাশরি।।" এই-ই নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুরের অন্তিম নিবেদন। তিনি অপ্রকট হয়েছিলেন নন্দোৎসবের দিনে। তাঁর অন্তে, এখন হরেকৃষ্ণবল্লভের উপরেই মহাপ্রভুর সেবার দায়িত্ব।

কালে হরেকৃষ্ণবল্লভের বিবাহ হয়। তাঁর পাঁচ পুত্র—১) ব্রজবল্লভ, ২) জগৎবল্লভ, ৩) শ্রীবল্লভ, ৪) গোপীবল্লভ ও ৫) ভুবনবল্লভ। এঁরা সকলেই সুগায়ক ও বাদক ছিলেন। হরেকৃষ্ণবল্লভ একদা ভিক্ষা করতে গিয়েছেন ময়নাডালের বাহিরে, গ্রামে। তিনি অত্যন্ত স্থূলাকৃতি ছিলেন। আটজন বাহকের বাহিত, পালকি ভিন্ন তাঁর গতাগতির উপায় ছিল না। তাঁর অনুপস্থিতি কালে নগরীর রাজা ময়নাডাল গ্রামের সামিল অঞ্চলে এসে উপস্থিত! তাঁর সাথে বহুতর লোক-লশকর ও সৈন্য-সামন্ত। সকলেই যখন আপন আপন কাজে ও রঙ্গরসে ব্যস্ত সে সময়ে রাজার সঙ্গী, শিকারী পাখি উড়ে এসে ময়নাডালে উপস্থিত হয় এবং গ্রামের লোকেদের উৎপাতে প্রাণ হারায়। রাজা এ সংবাদ পেয়ে ময়নাডালে এসে উপস্থিত হন। তিনি স্থানীয় গৌরাঙ্গসায়রের তটস্থ ক্ষিরণিগাছের তলায় এসে হরেকৃষ্ণ-বল্লভকে তলব করেন এবং শিকারী পাখির মৃত্যুর কারণে স্থানীয়দের প্রাণনাশের জন্য প্রস্তুত হন। হরেকৃষ্ণবল্লভ মৃত পাখিটিকে মহাপ্রভুর অঙ্গনে, কাপড় চাপা দিয়ে রেখে, মহাপ্রভুর মহিমা-কীর্ত্তন করতে থাকেন। হরেকৃষ্ণবল্লভের ব্যাকুলতায় মহাপ্রভুর করুণাশীষ ঝরে পড়লো। পাখিটি প্রাণ ফিরে পেল। নগরীর রাজা দেখে শুনে হরেকৃষ্ণবল্লভের চরণে পড়লেন।

রাজা হরেকৃষ্ণবল্লভকে প্রচুরতর ভূসম্পত্তি দিতে চাইলেও তিনি গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। অবশেষে রাজার অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখে বললেন, যদি একান্তই দিতে হয় তবে আপনি মহাপ্রভুর সেবাতে বাৎসরিক দুই টাকা মাত্র আনুকূল্য স্বরূপ দিতে পারেন। এই বলে হরেকৃষ্ণবল্লভ মন্দিরের আড়ালে চলে গেলেন। রাজা এই কালে হরেকৃষ্ণবল্লভের বড়ো ছেলে ব্রজবল্লভকে অনেক অনুনয় করে রাজি করিয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার জন্য মোট সাড়ে বারোশত বিঘা জমি দেবোত্তর করে দিয়ে আপন রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যথাকালে হরেকৃষ্ণবল্লভ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন করতে করতে দেহত্যাগ করলেন।

পরবর্ত্তী সেবাইত হলেন শ্রীহরেকৃষ্ণবল্লভের বড় ছেলে ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুর। তিনি নগরীর রাজার প্রদত্ত সম্পত্তি হতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার রীতিমত সুব্যবস্থা করলেন। পিতৃ-পিতামহসূত্রে ব্রজবল্লভ, সংগীত এবং মৃদঙ্গ-বাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিয়ম করেছিলেন—মনোহরশাহী গান এবং শ্রীখোল-বাজনা শিখতে যারা আসবেন ময়নাডালে, তাদের প্রসাদ, আশ্রয় ও গানবাজনা শিখতে কোন খরচপত্র লাগবে না।

ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুর অলৌকিক জীবনের অধিকারী ছিলেন। এক রাত্রে তিনি মহাপ্রভুর অঙ্গনে একটি খড়ের চালায় শুয়ে ছিলেন। মধ্যরাত্রে তাঁর তামাক খাবার ইচ্ছা হয়। তাঁর শিষ্য গৌরহরি প্রামাণিক রাতে তাঁর কাছে থাকতো। ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুর— "গৌর! আমাকে তামাক দাও"—বলে ডাকতে লাগলেন। যে কোন কারণেই হোক গৌরহরি প্রামাণিক সেইদিন বাড়ি গেছে। তার সাড়া না পেয়ে ব্রজবল্লভ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—"কই গৌর, তামাক দাও!" অল্প সময়ে মহাপ্রভু, গৌরহরি প্রামাণিকের রূপ ধরে, নিজে তামাক সেজে ব্রজবল্লভকে দেন। ব্রজবল্লভ তামাক খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ব্রজবল্লভ স্নানাদি কৃত্য সেরে সকলকে কীর্ত্তন শেখাতে বসেছেন এমন সময় পূর্ব্বোক্ত গৌরহরি প্রামাণিক এসে হাজির। তাকে দেখেই ব্রজবল্লভ বললেন—"গৌরহরি! গতকাল রাতে আমায় তুমি যেমন ভাবে তামাক সেজে দিয়েছিলে, তেমনি ভাবে একছিলিম তামাক সেজে দাও তো!" গৌরহরি প্রামাণিক বলল—"আমি কাল রাতে আপনার কাছে ছিলাম না। আমি তামাক দিই নাই।" ওদিকে পূজক ব্রাহ্মণ সেবার সময় দেখতে পেলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের হাতে রীতিমতো তামাক সাজার দাগ! পরম্পরাগত এমতি প্রসিদ্ধি।

ময়নাডালের ছয় মাইল পশ্চিমে বড়রা গ্রাম। গ্রামবাসী শুকদেব মিত্র ছিলেন রাজনগরের রাজার দেওয়ান। গলিতকুষ্ঠে মৃতকল্প হয়ে তিনি, আপন গ্রামের উত্তরে একটি সুগভীর জলাশয়ে আত্মবিসর্জনের সংকল্প গ্রহণ করেন। জলাশয়টি সুগভীর। কিন্তু শুকদেব যতই জলে নামেন জল সবসময়েই হাঁটুর নীচে। মনের দুঃখে শুকদেব, ময়নাডালে—মহাপ্রভুর অঙ্গনে বিরাজিত তমালতলায় এসে শুয়ে পড়লেন। পরদিন ভোরে শুকদেবকে ঐ স্থানে দেখতে পেয়ে ব্রজবল্লভ তাঁর নিকট হতে যাবতীয় বিবরণ জানতে পারলেন। এখন ব্রজবল্লভ নিজের গায়ের চাদর দিয়ে তাঁর গাটি ঝেড়ে দিলেন। ব্রজবল্লভের স্নেহপরশে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন শুকদেব।

ব্রজবল্লভ, শুকদেব মিত্রকে আদেশ করলেন ঘরে ফিরে যেতে কিন্তু শুকদেব বললেন আমি এখন বাড়ি না গিয়ে আমার পূর্ব্ব কর্মস্থল রাজনগরে গেলে ভালো হয়। পরিণামে দেখা গেল কিছুদিন পরে, প্রভূত অর্থ নিয়ে তিনি ময়নাডালে এসে উপস্থিত হলেন এবং একটি নতুন পূর্বদ্বুয়ারী মন্দির নির্মাণ করে তাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্থাপন উপলক্ষ্যে বিরাট কীর্ত্তন-মহোৎসব সমাধান করলেন। তা ছাড়া—মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত গৌরাঙ্গসায়র নামক পুষ্করিণীর পঙ্ক-উদ্ধার করে পাকা স্নানের ঘাট তৈরি করে দিলেন। ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুরের পুনঃ পুনঃ আদেশে শুকদেব এবার বড়রা গ্রামে আপন বাড়ীতে এলেন ও অচিরে বড়রা গ্রামে, মহাপ্রভুর সেবার জন্য একশত বিঘা জমি লাখরাজ দেবোত্তর ভূসম্পত্তি করে দিলেন।

একদা রাত্রি দুই প্রহরের সময় শতাধিক অতিথির একটি গোষ্ঠী ময়নাডালে এসে উপস্থিত হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। সেবাইত পরিবারের সকলেই তখন নিদ্রিত। শোনা যায় স্বয়ং মহাপ্রভু, এক গ্রামবাসীর বেশে অতিথি-গোষ্ঠীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হন এবং আশ্বাস দেন—যাবতীয় সমাধান হ'য়ে যাবে, সকলে বিশ্রাম করুন। তারপর, অতিথিদের মধ্য হতে চারজনকে ডেকে নিয়ে গ্রামের দক্ষিণে এক গন্ধবণিকের দোকানে উপস্থিত হয়ে আপন হাতের সোনার বালাটি বন্ধক দিয়ে প্রয়োজনীয় চাল-ডাল-তেল-মশলা প্রভৃতি এনে, তমালতলায় রান্নার ব্যবস্থা করে দিলেন। এবার তিনি গেলেন সবজী সংগ্রহ করতে। গ্রামের প্রান্তে এক বেগুনের ক্ষেত ছিল। ক্ষেতে নেমে বেগুন সংগ্রহ করবার সময়ে হঠাৎ পাহারারত মালিক এসে পড়ায় কিছু বেগুন নিয়ে মহাপ্রভু চলে আসেন। আসবার সময়ে মহাপ্রভুর চাদরখানি—বেগুনবাড়ির বেড়ায় থেকে গেল।

যাবতীয় চাল-ডাল-মশলাপত্র ও সব্জী এলে, রান্না ক'রে প্রসাদ পেয়ে অতিথিরা শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ব্রজবল্লভ এসে দেখে-শুনে হতবাক! একটু বেলায়, গতরাত্রে যার দোকান হতে চাল-ডাল প্রভৃতি আনা হয়েছে সেই গুরুচরণ গন্ধবণিক এসে উপস্থিত! তিনি ব্রজবল্লভকে দেখে বললেন—গতকাল রাত্রে আমার নিকট এই সোনার বালাটি বন্ধক দিয়ে, দোকান হতে যাবতীয় সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। রাতের অন্ধকারে আমি ভালো বুঝতে না পারলেও সকাল বেলায় দেখে বুঝলাম যে এটি শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই হাতের বালা। আপনি বালাটি ফেরৎ নিন। এমন সময়ে এসে উপস্থিত পূর্ব্বোক্ত বেগুনবাড়ির মালিক সদ্‌গোপ কুলজ শ্রীজিতু মণ্ডল। তাঁর হাতে মহাপ্রভুর গায়ের চাদর! ওদিকে মহাপ্রভুর মন্দির খুলে পূজারী দেখলেন যে—মহাপ্রভুর গায়ের চাদর নাই। পূজক শ্রীগোলোকচাঁদ অধিকারী এ সংবাদ ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয়কে দিতে গিয়ে দেখলেন— নিকটবর্তী চেঁড়োবাজার নিবাসী জিতু মণ্ডল চাদরখানি হাতে নিয়ে ব্রজবল্লভের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। জিতু মণ্ডলের নিকট জানা গেল, মহাপ্রভু স্বপ্নে জিতু মণ্ডলের স্ত্রীকে বলেছেন—রাতে অতিথিসেবার জন্য আমি তোমাদের বেগুনবাড়িতে বেগুন তুলতে গিয়ে তোমার স্বামীর তাড়ায়, আসবার সময় চাদরটি ফেলে এসেছি। পূর্ব্বোক্ত দোকানী গুরুচরণ বণিক এবং চেঁড়োবাজার নিবাসী বেগুনবাড়ির মালিক জিতু মণ্ডল উভয়েই যখন এই প্রসঙ্গ আস্বাদনে রত, তখন মহাপ্রভু-মন্দিরের পূজারী শ্রীগোলোকচাঁদ অধিকারী সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে আবার জানালেন, ঠাকুরের কাপড়ে কতকগুলি বেগুনের কাঁটা ও কাঁচা মাটি লেগে আছে। এখন সকল রহস্য প্রকাশ পেয়ে গেল! গুরুচরণ গন্ধবণিক ও জিতু মণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় এইদিন মহাপ্রভুর অঙ্গনে বিরাট মহোৎসব হয়ে গেল। গ্রামবাসীসহ, পূর্ব্বরাত্রে সমাগত অতিথিগণও এই উৎসবে যোগদান করলেন। গুরুচরণ গন্ধবণিক বালাটি ফেরৎ দিলেন এবং জিতু মণ্ডল পূর্ব্বোক্ত বেগুনবাড়ির জমিটি, শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে সমর্পণ করলেন। এইদিন হতে ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুর, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেন। দৈনিক সাড়ে বারো সের চালের অন্ন, দু'টি ডাল, পাঁচ/ছয়টি তরকারী ও পরমান্ন, মহাপ্রভুর ভোগে প্রত্যহ নিবেদিত হতে থাকে এবং সমবেত সকল অতিথি-অভ্যাগতকে প্রসাদ সমর্পিত হয়।

কিছুদিন পরে ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুর তাঁর পুত্রদ্বয়, আনন্দবল্লভ ও গোপালবল্লভের হাতে সেবা সমর্পণ করে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে বিশ্রাম লাভ করলেন। তারপর হতে নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুরের বংশানুক্রমে সেবা চলছে। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলার আছে। এখানে স্থানের অভাব। তাই ধীমহি-১৪১৮তে বাকি বিবরণগুলি দেওয়ার ইচ্ছা রইলো।

(তথ্যঋণ > শ্রদ্ধেয় শ্রীনির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুর। ময়নাডাল।)

সেবামঙ্গল সমাচার

৫ মে » ২০১১ » ২১বৈশাখ » ১৪১৮ » বৃহস্পতিবার—৯ মে » ২৫ বৈশাখ » সোমবার। লোকপাবন শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের সেবক শ্রীমৎ রামানন্দ দাস বাবাজী মহাশয়ের (রাজুদাদা) প্রথম বার্ষিক তিরোভাব স্মরণ। শুভ অধিবাস, মঞ্চপূজা, চতুর্বিংশতিপ্রহর (তিন দিন। তিন রাত্রি) ব্যাপী অখণ্ড সংকীর্ত্তন, নগরপরিক্রমা, সপরিজন শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গসহ চৌষট্টি মহান্তের ভোগারাধনা ও অবাধ প্রসাদ বিতরণে—উৎসব উজ্জ্বল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ও জগন্নাথের মন্দির। প্রতাপপুর। বারিপদা। উড়িষ্যা।

উড়িষ্যা > বারিপদা > প্রতাপপুর

(গজপতি প্রতাপরুদ্রের আরাধিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মন্দির)

২৬ জুন। ১১ আষাঢ়। রবিবার। কলকাতা হতে **উড়িষ্যা প্রদেশের "বারিপদা"র** দূরত্ব কমবেশি ২৪৭ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড আর উড়িষ্যার সীমান্ত পার হয়ে বারিপদায় উপস্থিতি। আরও ভেতরে বুড়া বড়ঙ্গ নদীর তীরে একটি শ্যামল-সুন্দর গ্রাম—প্রতাপপুর।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ অবধি শ্রীপুরুষোত্তমদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে ছিলেন। পরে তাঁর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। প্রতাপরুদ্রের অধীন দক্ষিণ দেশের অধিকারী (শাসক) রামানন্দ রায় ছিলেন, রাজার খুবই কাছাকাছি মানুষ, যাঁর সাথে মহাপ্রভুর বহুতর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হয়েছিল গোদাবরী তীরে, বিদ্যানগরে (বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী অঞ্চল)। রামানন্দ রায় হতে মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপূর, ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস, লীলাশুক শ্রীলোচন দাস ও শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখের বিরচিত গ্রন্থসমূহে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের বিষয়ে বহুতর বিবরণাদিতে প্রমাণিত হয়—প্রতাপরুদ্র যেমন বিপক্ষকুলকালাগ্নিরুদ্র-স্বরূপ ছিলেন ততোধিক হরি-গুরুপরায়ণ ছিলেন। "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্" বা মুরারিগুপ্তের কড়চা পাঠে অনুভূত হয়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দর্শনের জন্য গজপতি প্রতাপরুদ্রের উদ্দাম উৎকণ্ঠা! শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দর্শনের উত্তরকালে তিনি পুরী > জগন্নাথ মন্দিরের 'বাইশ পাহাচ' খ্যাত স্থানের সন্নিকট কূর্মবেড়ের ভিতরে ডান হাতে উত্তরদিকে, মহাপ্রভুর এক দারুময় মুণ্ডিত মস্তক বসা বিগ্রহ নির্মাণ করে, তা স্থাপন করেন (১)। এ ছাড়াও জগন্নাথের মূল মন্দিরের বাহিরে, মন্দির-এলাকার মাঝেই মূল মন্দিরের গায়ে গায়ে দক্ষিণ মুখে এক ষড়ভুজ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির রয়েছে (২)। জগন্নাথের নাটমন্দিরের ভিতরে উত্তর দিকে দেওয়ালে পূর্বমুখী ষড়ভুজ মূর্ত্তি বর্ত্তমান (৩)। জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ দরজা-সংলগ্ন পূর্বদিকের একটি ঘরে পশ্চিমমুখী, প্রমাণ ষড়ভুজ মূর্ত্তি বিরাজমান (৪)। এ গুলির মাঝে ২নং ষড়ভুজ বিগ্রহটি ছাড়া, অপরগুলি সবই গজপতি মহারাজের উদ্যোগে নির্মিত। এ ছাড়াও মহারাজ প্রতাপরুদ্র পুরীতে বিরাজিত আপন প্রাসাদে (পুরুণা নহর। বালিসাহি) শ্রীশ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পরই এসেছিলেন পুরীতে, সেই সময়ে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন প্রতাপরুদ্র, পুরীর বাহিরে। যখন তিনি এলেন পুরীতে, সেই সময় মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে চলে গেছেন। দুই বছরের ওপরে সময় লেগেছিল মহাপ্রভুর, সেই বারের দক্ষিণ-যাতায়াতে। পরবর্তী সময়ে যখন মহারাজের সৌভাগ্য হয়েছিল মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের এবং আরও পরে যখন স্বতঃই প্রতাপরুদ্রের অন্তরে জেগেছে মহাপ্রভুর প্রতি অগাধ প্রণয় আর অবাধ শরণাগতি, তখন হতেই বুঝি ক্ষোভ ছিল তাঁর, প্রভুর প্রথম আগমন কালে তিনি বাহিরে ছিলেন, মহাপ্রভুকে তখন দর্শন করেন নাই ব'লে। সে অভাব তাঁর বহুলাংশে পুরণ হয়েছিল সার্বভৌম, রামানন্দের সঙ্গপ্রসঙ্গ ও মহাপ্রভুর সাক্ষাত দর্শনে তথা দূর হতে, রথের সামনে পথোপরি স-সহচর নৃত্যকীর্ত্তনরত মহাপ্রভুকে দেখে।

গজপতি প্রতাপরুদ্রের জীবনটি একান্তভাবেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতি আনুগত্যময়। তিনি যখন জানতে পারলেন যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাবার জন্য বারবার সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রামানন্দ রায়কে জানাচ্ছেন, তখন মহাপ্রভুর ভাবীবিরহে তিনি কাতর হয়ে পড়েন এবং শিল্পী ডেকে **মহাপ্রভুর একটি দারুময় বিগ্রহ নির্মাণ করান।** কথিত হয় রাজা একান্তে আপন বাসে এই বিগ্রহ সেবা করতেন। এদিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু, আজ/কাল করে বৃন্দাবনে রওনা হতে পারছেন না। তিনি ভক্ত-পরতন্ত্র। তাই সার্বভৌম / রামানন্দাদিকে তিনি দুঃখ দিতে চাইছেন না। এ চিত্র নিপুনভাবে এঁকেছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য।১৬) "মহাপ্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন। শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইল বিমন।। সার্বভৌম, রামানন্দ আনি দুইজনে। দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচনে।। নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অনত্র যাইতে। তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।। তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়। প্রভুরে রাখিতে কর যতেক উপায়।।" রামানন্দ আর সার্বভৌমের সাথে,অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে যখন মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাবার প্রসঙ্গ তুললেন, তখন ...."আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়। যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়।।" এর মাঝে অনেক সময় বয়ে গেল। অবশেষে মহাপ্রভু একরকম জোর করেই রওনা হলেন বিজয়া দশমীতে। "জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।" ভবানীপুর ও ভুবনেশ্বর হয়ে কটকে এলেন। রামানন্দ রায়ের বাহির-উদ্যানে যখন প্রভু বিশ্রামরত তখনই গজপতি প্রতাপরুদ্র এসে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর সামনে। "তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হইল মন। উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।।" রাজা, নিজ রাজ্যের বিষয়ীদের পত্র লিখে, পথে মহাপ্রভুর জন্য সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা রাখতে বললেন। সে আদেশও যথাযথ পালিত হয়েছিল। "প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ। নব্যগৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন।।" এ প্রসঙ্গে কীর্ত্তনমুখে শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় যথার্থই বলেছেন—"(রাজা) প্রতাপরুদ্র আছেন নিজবাসে। (কিন্তু) প্রাণ আছে গৌরপদ-পাশে।।"

প্রতাপরুদ্র ইচ্ছা করলেন, তাঁর অন্তঃপুরবাসিনীদেরও একবার কৃতার্থ করবেন প্রভুর দর্শনে। মহিষীরা সকলে ভক্তি-পথের অনুকূলেও নয়, সবার গৌরতৃষ্ণাও নাই, তবুও রাজার চেষ্টায় সবাই-ই দেখতে পেলেন মহাপ্রভুকে। প্রভুর করুণার সাথে সাথেই প্রেমধন লাভ হল সবার। "অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি।"

প্রসিদ্ধি—উত্তরকালে মহাপ্রভুর অদর্শনে কাতর হয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্র, নীলাচল/কটক পরিত্যাগ করে বৃন্দাবন যাবেন বলে, পথে পথে এগিয়ে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের, তৎকালীন রাজধানী বারিপদা হতে দক্ষিণ-পূর্বে কিছুদূরে (২৭ কি.মি.) রামচন্দ্রপুরে এসে সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকেন। রাজার সাথে **পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ** ছিলেন। রাজা এসে বিশ্রাম নিয়ে বৃন্দাবনের পথে এগিয়ে যাবার মন করলেও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থাতেই আদেশ করলেন মন্দির নির্মাণের। তুরন্ত্ কাজ এগোতে লাগলো। শুভদিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা সমাহিত। মন্দিরে পুরী হতে আগত **সেই দারুময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহের** পাশে জগন্নাথ (বলদেব । সুভদ্রাসহ) ও দধিবামন বিগ্রহও বসলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রদ্ধালু ৫৪ জন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ গ্রামবাসীদের উপর মহাপ্রভু-আদি বিগ্রহের সেবা ন্যস্ত করলেন ও সেবা-সমাধানের জন্য প্রচুরতর ভূসম্পত্তি দিলেন। সাথে বহুতর বস্ত্র-অলংকারাদি ও তৈজসপত্র। সেবা সুস্থভাবে চলতে লাগলো। অসুস্থ রাজা কিছুকাল পরেই, স্বধামে গমন করলেন। সময়—১৫৪০ খৃষ্টাব্দ।

রাজার দেহান্তে নিকটবর্ত্তী বুড়া বড়ঙ্গ নদীতীরে তাঁর দাহাদি কার্য্য সমাহিত হয় ও দাহস্থানটির উপর একটি স্মৃতিমন্দির তৈরি হয়। প্রতাপরুদ্রের দেহত্যাগের পর হতে রামচন্দ্রপুর "প্রতাপপুর" নামে সুচিহ্নিত হয়। স্থানীয়গণ বলেন এই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরটি, উত্তরকালে কালাপাহাড় ধ্বংস করেন। পূর্ব হতেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং জগন্নাথাদি ও দধিবামন বিগ্রহদের স্থানান্তরিত করা হয়েছিল পাশাপাশি হরিপুরের দুর্গে। প্রথম মন্দিরের পাশেই নির্মিত হয়েছে পরবর্তী মন্দির, যে মন্দিরে এখন বিগ্রহগণ বিরাজিত।

প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, বকুল আর স্বর্ণচাঁপায় ঘেরা ছায়াসুনিবিড় স্থানে মর্মরমণ্ডিত বর্ত্তমান শ্রীমন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আঙ্গিকে নির্মিত। পাশেই দেখা যাচ্ছে, প্রায়ই মাটিতে (ভূগর্ভে) হারিয়ে যাওয়া, পুরাতন/প্রথম মন্দিরের আংশিক ভিতের ইঁটের গাঁথনি। বর্ত্তমান মন্দিরে উঠতেই গরুড়স্তম্ভের উপরে গরুড়মূর্ত্তি। স্নানযাত্রার পরে, এখন জগন্নাথআদি চারজনের অঙ্গরাগের কাজ চলছে। ভোগ লেগেছে সটির পালোর উপরে ভেজানো মুগ—শালপাতার বাটিতে। আর কাঁঠাল। শ্রীচরণামৃত ও প্রসাদ মিললো। বড়সড় চত্বরে একটি প্রমাণ রথ নির্মাণের কাজ চলছে। সেবক দুইজন সাথে করে নিয়ে গেলেন জগন্নাথের মাসিরবাড়ি (গুণ্ডিচামন্দির)তে। সেখানে নিতাইগৌরের সেবা রয়েছে। সেবক প্রহ্লাদ দাস। বড় স্নিগ্ধ ব্যবহার। চোখে জল, ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করতে। দ্বাদশ অঙ্গে তিলক দেখে অনুমান হলেও জিজ্ঞাসা করলাম > "কোন পরিবার?" সাশ্রুনয়নে বললেন "আউ কঁড়? নিত্যানন্দ ....।" প্রতাপরুদ্রের চিতা-সমাধি ধ্বসে নেমে গেছে নদীর গর্ভে—বললেন প্রহ্লাদ দাসই। আবার ঘুরে এলাম শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মন্দিরে। মাঝারি জগন্নাথ বিগ্রহদের অবস্থান মাটিতে, অঙ্গরাগ সেবা হেতু। মন্দিরের মূল দরজা দিয়ে দেখলে, বামপাশে ছোট নিতাই-গৌর বিগ্রহ। আর ডান দিকের একদম দেওয়াল ঘেঁষে একপাশে দাঁড়িয়ে **প্রতাপরুদ্রের প্রাণাধিক সেই দারুময় মহাপ্রভু বিগ্রহ।** প্রায় চারফুট উচ্চতা। চরণযুগলের ভঙ্গি শ্রীকৃষ্ণের মত। অর্দ্ধেক ইঁটের আকারের একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর, কোনও মতে দাঁড়িয়ে। কাপড় চাদর পরা। সবই অবিন্যস্ত। ডান হাত উপরে তোলা। বাম হাত নিচের দিকে। যাকে রাজা নিয়ে এসেছেন পুরী হতে প্রতাপপুরে। যে বিগ্রহ তাঁর আমরণ সঙ্গী! দীর্ঘ কাল অঙ্গরাগ হয়নি। শ্রীঅঙ্গের বহুস্থান ফেটে গেছে দেখ্‌ভালের অভাবে! দেখেশুনে মনে হয় যেন একান্তই অনাহূত জন!! কি দুর্নিবার কালের গতি!!!

প্রতাপপুর। মহাপ্রভুর মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বুড়া বড়ঙ্গ নদী।